খণ্ড ৬, সংখ্যা ৭ ভাবনগর জুন ২০১৭
Vol. 6, No. 7 BHĀBANAGARA June 2017

বাংলাদেশের ফোকলোর : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও আধুনিকতার নতুন দিগন্ত

শামসুজ্জামান খান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ আয়োজিত বিভিন্ন প্রাণীর মুখোশ শোভিত মঙ্গল শোভাযাত্রা

Folklore of Bangladesh: Historical Context and New Horizon of Modernism

Shamsuzzaman Khan

Abstract

The sphere of Bangladeshi folklore is immense and rich in diverse elements. This unique folk culture is well-heeled with diverse, multidimensional and internal dynamism in the wider surroundings of our social and geographical structure, influence of rivers and climate, anthropological diversity and characters, behavior-belief-values, notion-tradition, world view and mental and psychological state and ever changing trend. The folk culture of this land has changed their religious features due to various historical and social projections and powered evolution in touch of the ethnic peoples of this land as well as expatriate communities. Thus the culture got a unique shape of worldly and life-oriented culture. On the occasion of annual worshipping or seasonal event, the devotees put their god on chariot, cart or sedan and in procession travelled from one place to another place. The modern 'Jatra' came out of this procession. It means that at the inception 'Jatra' was a part of religious practice which in course of time turned into folk drama. Gradually, 'Jatra' evolved from its religious identity into performing art depicting socio-political issues. Literature, history and biography of famous personalities also became the base of the plot of a jatra performance. For example, 'Lenin Jatra', 'Hitlar Jatra' or 'Ram Mohan Jatra' in West Bengal and Amolendu Biswas' 'Michael Jatra' in Bangladesh became popular. This evolution of 'Jatra' is discussed in this article in light of internationally practiced theories and methods. The article heads towards modern and scientific methods of folklore research considering the theories of Richard M. Dorson from USA, German scholar Johann Gottfried Von Herder (1744-1803), Grimm brothers, Henrik Porthan and Elias Ionnrot from Finnland, William Thoms and Bishop Percy Thoms from England, C.W. Von Sydow (1878-1952) from Sweden, Chek scholar Dusan Zbavitel, contemporary folklore theorist Dan Ben-Amos, Richard Bauman, Alan Dundes, and Hermann Bausinger. Moreover, this article analyses the folklore practice of Bengali folklorists Rabindranath Tagore, Abanindranath Tagore, Reverend Lalbihari De, Sir Sharat Chandra Mitra, Dakkhinaranjan Mitra Majumdar, Upendra Kishore Roy Chowdhury, Dr. Dinesh Chandra Sen, Khan Sahib Abul Wali, Abdul Karim Sahityabisharad, Gurusaday Dutt, Muhammad Shahidullah, Chndrakumar Dey and Ashutosh Chowdhury and discussed their importance and limitation.

বিপুল ও বিচিত্র উপাদানে বাংলাদেশের ফোকলোর (Folklore) ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। বাংলাদেশের সামাজিক ও ভূপ্রাকৃতিক বিন্যাস, নদীনালা ও জলবৃষ্টির প্রভাব, নৃগোষ্ঠীর ধরন ও বৈশিষ্ট্য এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, চিন্তা-চেতনা, আচার-বিশ্বাস-মূল্যবোধ, সংস্কার-ঐতিহ্য তথা বিশ্বদৃষ্টির (world view) নিরন্তর পরিবর্তনশীলতা এবং মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক স্বভাবের বৃহৎ পরিমণ্ডলের মধ্যেই গড়ে উঠেছে আমাদের এই বিচিত্র, বহুমাত্রিক এবং অভ্যন্তরীণ গতিশীলতায় ঋদ্ধ লোকজসংস্কৃতি।

বিশ্ব ফোকলোর-চর্চার সূচনা-স্থান (nodal point) হিসেবে আজ থেকে দুহাজার বছর আগের চীন দেশের হান রাজবংশের আমলের কথা বলা হয়। শাসনকাজের সুবিধার্থে সরকারিভাবে জনমানসের পরিচয় জানার জন্যই নাকি ফোকলোরকে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপাদান হিসেবে ভাবা হয়েছিল। সেজন্য ওই রাজবংশ ফোকলোর-চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা দান করে।

ব্রিটিশ অধিকারের পর বঙ্গদেশে ইংরেজদের দ্বারা ফোকলোর-চর্চার সূত্রপাতও শাসিতের মনোভাব-ভঙ্গি মূলগতভাবে জানার ইচ্ছাপ্রসূত—এ ধারণাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ বিখ্যাত ইংরেজ লেখক, অভিধানকার ও পণ্ডিত ড. জনসন (১৭০৯-৮৪) ভারতের প্রথম ইংরেজ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে ৩০ মার্চ ১৭৭৪-এ লেখেন, 'To examine nicely the tradition and histories of the East.' জনসনের জ্ঞানপ্রীতির সঙ্গে ইংরেজ শাসকের শাসন-নীতির কৌশলগত (Strategic) সমন্বয় এক্ষেত্রে কাজ করে থাকতে পারে। কারণ ম্যাকলে এদেশের জ্ঞান-বিদ্যাকে কোনো মূল্যই দেননি। ড. জনসন সেদিক থেকে কতখানি খাঁটি ছিলেন সে প্রশ্ন অবশ্য থেকেই যায়।

এক

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, বাংলাদেশের সমাজ গঠনের এক ধূসর অতীতে এখানকার লোকায়ত বাঙ্ময়ের (Folkloric expressions) উন্মেষ-পর্বের সূত্রপাত। প্রাচীন বাংলার স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজে গ্রামবাসীদের অনুষ্ঠান-উৎসব রূপ পেত প্রধানত গ্রামদেবতাকে ঘিরে। এর বাইরেও কিছু উৎসবের সন্ধান মেলে।[১] অর্থাৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সামাজিক

আচার দুয়েরই অবস্থান ছিল পাশাপাশি। মানুষের সাহিত্য ও সংগীতবোধও বিকশিত হচ্ছিল তখন। স্থাবর ও জঙ্গম দুই ধরনের উৎসবের বিষয়েই তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। দেবমন্দিরের সামনে দেবমাহাত্ম্যময় গীত এবং তা দীর্ঘ হলে একঘেয়েমি এড়ানোর উপায় হিসেবে জুড়ে দেওয়া পুতুলনাচ; অর্থাৎ পুতুলনাচের (Puppet) সঙ্গে চলত নাচ-গান। পুতুল পাওয়া না গেলে পট ব্যবহারের যে রীতি ছিল তাকে বলা হতো পঞ্চালিকা। এটি স্থাবর অনুষ্ঠান। এসব ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে আমাদের লোকজ তথা সাধারণ মানুষের সংস্কৃতি। পরবর্তীকালে তা নানা ঐতিহাসিক ও সামাজিক অভিঘাতে ধর্মীয় খোলস পরিবর্তন করে রূপ নিয়েছে এদেশের আদি জনগোষ্ঠী ও বহিরাগত নানা জাতি-উপজাতির সমন্বিত এক ইহজাগতিক ও জীবনধর্মী সংস্কৃতিতে। প্রকৃতপক্ষে আদিম আচার-অনুষ্ঠান ও পরবর্তীকালের ধর্ম ও জাদু-বিশ্বাসভিত্তিক সংস্কৃতি-উপাদানে বাঙালি সংস্কৃতির প্রাথমিক পর্বের ভিত্তি নির্মিত।

জাদু-বিশ্বাসভিত্তিক এরকম দুটি প্রাচীন লোক-উৎসবের নাম 'ভাদু' ও 'তুষু'। বাঙালি জনগোষ্ঠীর অস্ট্রিক শাখা থেকে উদ্ভূত কৃষিজীবী অংশটির এ দুটি উৎসবই ফসলের উৎসব হিসেবে পরিচিত। ভাদ্র ও পৌষ মাসে উৎসব দুটি বঙ্গদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে, বিশেষ করে পশ্চিম ও উত্তর বাংলার প্রান্তিক এলাকায় উদ্‌যাপিত হতো, রাঢ় বাংলায় এখনো হয়। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল ছেলেমেয়েদের 'তোসলা' ও

ভাদু নারী মূর্তি, পশ্চিমবঙ্গ

'পোষলা' উৎসব। ড. সুকুমার সেন বলেন, 'এ দুটি বঙ্গদেশের খুব প্রাচীন প্রথা।' কলিঙ্গ অনুশাসনে সম্রাট অশোক বলেছেন, 'আমার এই নীতি অনুশাসন যেন প্রজারা তিষ্য নক্ষত্রে (অর্থাৎ পোষালি উৎসবের সময়) শোনে এবং অন্য সময়েও ইচ্ছামতো শুনিতে পায়।'[২] ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের লোকজসংস্কৃতির উদ্ভবের ইতিহাসকে চিহ্নিত করতে গেলে প্রাচীন এ উৎসব দুটির কথা তাই বিশেষভাবে উল্লেখ প্রয়োজন।

মধ্যযুগের বাংলার লৌকিক উৎসব-অনুষ্ঠানের একটি অনুষঙ্গ হিসেবে আমরা পাই 'মঙ্গল গীতিকা।' বিয়ের অনুষ্ঠানে আমোদ-প্রমোদের অংশ হিসেবে মেয়েরা এ মঙ্গল গান গাইতেন। এদের বলা হতো 'মঙ্গল গায়িকা'। শুধু আনন্দ-ফুর্তি নয়, এর সঙ্গে যুক্ত ছিল শুভকামনাও। এ ধরনের গান গ্রামীণ বিয়ের অনুষ্ঠানে এখনো কোথাও কোথাও গীত হতে দেখা যায়; তবে এখন আর সে পেশাদার 'মঙ্গল' গায়িকারা নেই। তাদের জায়গা দখল করে নিয়েছে আত্মীয়-বান্ধব নিয়ে গঠিত 'নায়রিরা'।

জঙ্গম উৎসব বলা যায় 'যাত্রা'কে। বাৎসরিক পূজা বা সাময়িক কোনো পর্ব উপলক্ষ্যে দেবতাকে রথে, শকটে অথবা শিবিকায় চড়িয়ে ভক্তরা শোভাযাত্রা করে পরিণীত করতে করতে এক স্থান হতে অন্য স্থানে যেতেন। এ শোভাযাত্রা থেকে আধুনিক 'যাত্রা'র উদ্ভব।[৩] অর্থাৎ সূচনাপর্বে 'যাত্রা' ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ; কিন্তু পরবর্তীকালের এ প্রবল লোকনাট্যটি (Folk drama) তার জন্ম ও বিকাশের দীর্ঘ কালপরিক্রমায় ধীরে ধীরে ধর্মীয় বৃত্ত অতিক্রম করে সামাজিক বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সেজন্যই ইতিহাস ও পুরাণভিত্তিক যাত্রার পরিবর্তে আমরা এখন লক্ষ করি সামাজিক ও সমকালীন বিষয়ভিত্তিক যাত্রাগানের উপস্থাপনা। অতি সাম্প্রতিককালে রাজনীতিক ও খ্যাতিমান ব্যক্তিদের জীবনকাহিনি এবং সাহিত্যনির্ভর যাত্রাপালাও

অমলেন্দু বিশ্বাস ও তার যাত্রাভিনয়

সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে—যেমন পশ্চিম বাংলার 'লেনিন যাত্রা', 'হিটলার যাত্রা' বা 'রামমোহন যাত্রা' এবং বাংলাদেশে প্রয়াত অমলেন্দু বিশ্বাস তৈরি করেছিলেন 'মাইকেল যাত্রা'।

বাংলা ফোকলোরের অন্যতম প্রাচীন উপাদান ধাঁধা, হেঁয়ালি ও প্রবাদ। লোকজসংস্কৃতি ডায়াক্রনিক (diachronic) অনুসন্ধানে প্রাচীনকাল থেকেই উপাদান দুটির চালু থাকার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। লোকসমাজে সাধারণভাবে ধাঁধা ও প্রবাদের ব্যবহার থাকলেও বিবাহ অনুষ্ঠানে আবশ্যিক বিষয় ছিল ধাঁধা ও তার উত্তর প্রদান। গ্রাম-বাংলায় বিবাহ উৎসবে ধাঁধার উত্তর দিতে না পারলে বরপক্ষকে বড়ই নাজেহাল হতে হতো। সেজন্যই ধাঁধা এবং হেঁয়ালি ও তার উত্তর জানা মধ্যযুগ ও তার পরবর্তীকালের বাংলাদেশে একটি বিশেষ সম্মানের বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতো। ধাঁধার খেলায় সম্মান রক্ষার জন্য 'তিনমাথা' অর্থাৎ জ্ঞান-বৃদ্ধকে গোপনে আবৃত শিবিকা বা বিশেষভাবে নির্মিত ঝোলায় করে বরযাত্রী হিসেবে নেওয়া হতো বলেও গল্প প্রচলিত।

বাংলা ফোকলোরের দীর্ঘ ইতিহাস আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পটে স্থাপন করে হয়তো বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। আমাদের অতটা বিশদ হবার সুযোগ নেই। তবে বৌদ্ধ তান্ত্রিকসাধক, নাথযোগী, বৈষ্ণব, সহজিয়াসহ নানা লোকধর্ম, ইসলামি আখ্যান, সুফিবাদ সব মিলেই আমাদের লোকজসংস্কৃতির বিশাল আকাশ। চৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রভাবে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গান ও কথকতা বঙ্গদেশকে নব ভাবরসে আপ্লুত করেছে। অন্যদিকে বাংলা ফোকলোরের চাঁদ সওদাগর-বেহুলা লখিন্দর-এর লোকপুরাণ ও লৌকিক মহাকাব্য এবং কারবালা কাহিনি দুই প্রধান ধর্ম সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ভুবনকে একই বৃন্তে সংযুক্ত করেছে। এর সঙ্গে আচার-অনুষ্ঠান, ব্রত ও মেয়েলি উৎসব লৌকিক জীবনকে করে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও প্রাণবন্ত।

ঐতিহাসিক প্রসঙ্গসূত্র ধরিয়ে দেওয়ার সুবাদে আমরা বাংলা ফোকলোরের উদ্ভবের ইতিহাসের উপর কিছুটা আলোকপাত করার প্রয়াস পেয়েছি। আধুনিক ফোকলোর-চর্চায় উদ্ভবের ইতিহাস নিয়ে তেমন উৎসাহ দেখান না।[৪] সাম্প্রতিককালের কনটেক্সট (context), পারফরম্যান্স[৫] (Performance), পাঠভেদ (variant), ফাংশন (Function) সম্পর্কে উৎসাহী তাত্ত্বিকরা। কিন্তু আমাদের দেশের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে সিনক্রনিক (Synchronic) আলোচনাই যথেষ্ট নয়—ডায়াক্রনিক (ঐতিহাসিক পটে স্থাপন করে) আলোচনাও বহু সমস্যার গ্রন্থিমোচনের সহায়ক। আমরা আশা করব ভবিষ্যতে এ বিষয়ে অনুপুঙ্খ, বিজ্ঞানভিত্তিক ও তথ্যনিষ্ঠ আলোচনার সূত্রপাত হবে। বাঙালির জাতিতাত্ত্বিক আত্মপরিচয় (ethnic identity) উদ্ধারের লক্ষ্যেই আমাদের লোকজসংস্কৃতির উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাস নির্মাণ করা প্রয়োজন।

আমাদের লোকজসংস্কৃতিক নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হলেও এ প্রাথমিক এবং অতিপ্রয়োজনীয় কাজটি এখনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়নি। বাঙালির নৃতাত্ত্বিক ও বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত করে এ বিষয়টির ওপর যথাযথ আলোকপাত করা না হলে আমাদের ফোকলোর-চর্চা আধুনিক ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারবে না। মার্কিন মুলুকের ফোকলোরবিদ্যার একালের অন্যতম প্রধান স্থপতি ড. রিচার্ড এম. ডরসন (Richard M. Dorson) 'আমেরিকান ফোকলোর' (American Folklore), (১৯৫৯) বইটিকে ওইভাবে বিন্যস্ত করেছেন। অন্যদিকে 'Folklore in the Modern World' (১৯৭৯) সম্পাদনা করে তিনি আধুনিক ফোকলোর-চর্চার উৎসমুখটিও খুলে দিয়েছেন। ফিনল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডেও এ ধরনের বহু বই লেখা হয়েছে। জার্মানিতে ইয়োহান গটফ্রিড ভন হার্ডার (Johann Gottfried Von Herder (1744-1803) প্রমুখের কাজের ধরনও তাই। তবে বর্তমানে আমেরিকা ও ইউরোপে পারফরম্যান্স স্টাডি প্রাধান্য পাওয়ায় সিনক্রনিক পদ্ধতিই ব্যাপকভাবে অনুসৃত হচ্ছে।

এমতাবস্থায় বাংলাদেশের ফোকলোর-চর্চার একটি উপযোগী মডেল তৈরি করা না গেলে আমাদের ফোকলোর-চর্চা হয়তো আরো দীর্ঘকাল থেকে যাবে বর্তমানের মতোই স্বতঃস্ফূর্ত, শিথিল এবং অগোছালো। অথচ যে কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণার মতো ফোকলোর-চর্চাতেও স্বতঃস্ফূর্ততা নয়, যুক্তি, বিশ্লেষণ এবং প্রামাণ্য তথ্য চাই। আমাদের কোনো কোনো পণ্ডিত অবশ্য ফোকলোর-চর্চার সঙ্গে ইতিহাসকে এনেছেন। কিন্তু সে প্রয়াসে ইতিহাস ও ফোকলোরের সম্পর্কসূত্র সুস্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠেনি; তাতে নেই যুক্তিপরম্পরা ও তথ্যের বৈজ্ঞানিক উপস্থাপনা।

প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানই আধুনিক ফোকলোরের জন্মদাতা। সামাজিক অগ্রগতি ও বিজ্ঞান প্রযুক্তির উদ্ভবই ফোকলোরকে চিহ্নিতকরণে সহায়ক হয়েছে। আগেও

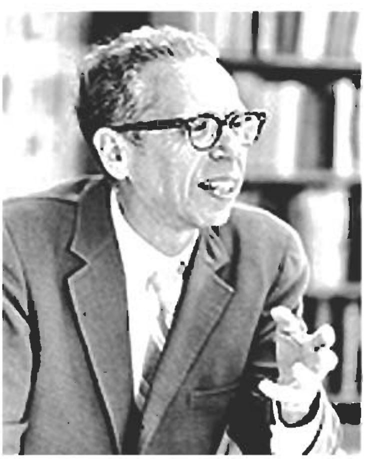

আমেরিকান পণ্ডিত রিচার্ড এম. ডরসন

জার্মানির পণ্ডিত ইয়োহান গটফ্রিড ভন হার্ডার

জার্মানের পৌরাণিক কাহিনী এবং লোককাহিনী সংগ্রাহক গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয় ইয়াকপ গ্রিম এবং ভিলহেল্ম গ্রিম

ফোকলোর ছিল, তবে তা সমাজদেহে এমনভাবে মিশে ছিল যে তাকে আলাদা করে বোঝা যেত না। বঙ্গদেশে ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুশৃঙ্খল চর্চার সঙ্গে এদেশে ফোকলোর-চর্চারও সাংগঠনিক সূত্রপাত।

ইংরেজ মিশনারি ও সিভিলিয়ানরা ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলা ফোকলোর নিয়ে কাজ করলেও দেশীয় অনুরাগীদের মধ্যে পরিকল্পিত প্রয়াস শুরু হয় বর্তমান শতকের প্রথম দিকে। জাতীয়তাবাদী চেতনা ও ঐতিহ্যানুসন্ধানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় পরে তা প্রবল জোয়ারে পরিণত হয়। শুধু বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নয় জাতীয়তাবাদও ফোকলোরের পিতৃত্ব দাবি করতে পারে।

ফোকলোরকে বুর্জোয়া সমাজের নস্টালজিক (nostalgic) চেতনার ফসল—তাদের অতীতের দিকে ফিরে তাকানো হিসেবেও আখ্যাত করা হয়েছে। জার্মানি, ইংল্যান্ড তথা ইউরোপে শিল্প বিপ্লব ও নগরায়ন ঘটে যাওয়ার পর ইয়োহান হার্ডার, গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়, ফিনল্যান্ডে হেনরি পোর্থান, ইলিয়াস লনরুট (Elias lonnrot), ইংল্যান্ডে উইলিয়াম থমস, বিশপ পার্সি থমস, সুইডেনে কাল উয়েলহেইম ভন সিডো (C.W. Von Sydow 1878-1952) প্রমুখ এই অনুসন্ধিৎসায় নিয়োজিত হন। একই ধরনের চেতনা এবং রোমান্টিসিজমের প্রেরণা থেকে লোকঐতিহ্য সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন বঙ্গদেশের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রেভারেন্ড লালবিহারী দে, স্যার শরৎচন্দ্র মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, ড. দীনেশচন্দ্র সেন, খান সাহেব আবুল ওয়ালি, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, গুরুসদয় দত্ত, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, চন্দ্রকুমার দে, আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখ। সাময়িক পত্রে কিছু বিচ্ছিন্ন লেখালেখির পর ১৯০৭ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'লোকসাহিত্য' প্রবন্ধ সংকলটি এ ধরনের চর্চার একটা ধরন বেঁধে দেয়।

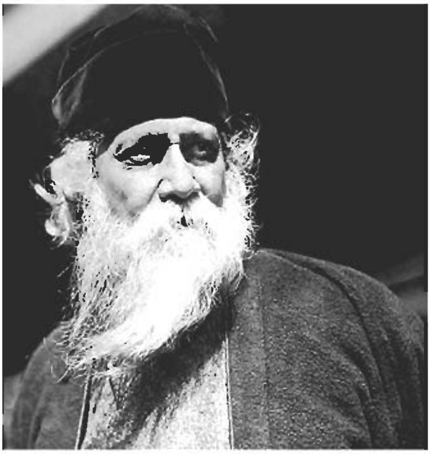

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

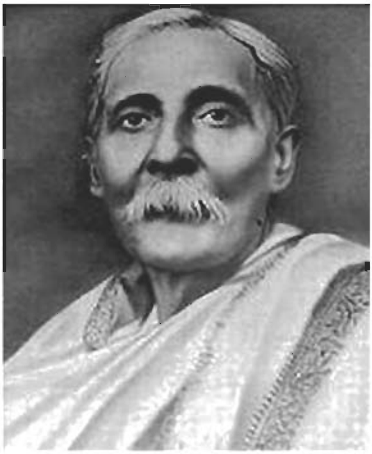

দীনেশচন্দ্র সেন

মৈমনসিংহ-গীতিকা

[রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপ বক্তৃতা ১৩২২-২৪]

[পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা]

(তৃতীয় সংস্করণ)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, বঙ্গসাহিত্যের অধ্যাপক এবং
প্রধান পরীক্ষক ও "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য," "রামায়ণী কথা,"
প্রভৃতি বিবিধ বাঙ্গালা ও ইংরাজী গ্রন্থ-প্রণেতা

রায় বাহাদুর ৺দীনেশচন্দ্র সেন, বি.এ., ডি.লিট.

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

UNIVERSITY OF CALCUTTA
ADVANCEMENT OF LEARNING

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৫৮

মূল্য ১২৲

দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহ-গীতিকা গ্রন্থের প্রচ্ছদ

রবীন্দ্রনাথ আমাদের লোকমানসের প্রবল শক্তি, গভীর চিন্তাচেতনা ও দার্শনিক ভাব-গভীরতার মূল্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে দেশ-বিদেশের বিদ্বৎসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।[৬] এমনকি তিনি লোকশিল্পের বিভিন্ন খাঁটি উপাদান সংগ্রহের জন্যও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সংগ্রাহক নিয়োগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই অনুপ্রাণিত উদ্যোগ থেকে শিক্ষা নিয়ে ড. দীনেশচন্দ্র সেন কাজ করেন 'পূর্ববঙ্গ' ও 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' নিয়ে। চন্দ্রকুমার দে, কেদারনাথ মজুমদার, কবি জসীমউদ্‌দীন, আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখ তাঁকে সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন ময়মনসিংহ এবং তৎকালীন পূর্ববাংলার মানবিক চেতনায় ভাস্বর লৌকিক গাথাকাব্য। ড. দীনেশচন্দ্র সেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগ ও অর্থসাহায্যে এসব গীতিকা প্রকাশ করেন বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে (১৯২৩-৩২)। শুধু বাঙালি পাঠক নয়, বহির্বিশ্বেও অসাধারণ মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ এ গাথাকাব্যকে তুলে ধরার জন্য ড. সেন স্বকৃত ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর আমাদের লোকসাহিত্য নিয়ে উন্নত বিশ্বে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ফরাসি লেখক রঁমারোলাঁ, সিলভা লেঁভি, জার্মান পণ্ডিত হেনজ মোডে প্রমুখ পূর্ববাংলার গাথাকাব্যের অনিন্দ্যসৌন্দর্য এবং মানসিক সরসতায় মুগ্ধ হন। বাংলার মৌলিক সংস্কৃতির বিশ্ব পরিচিতিতে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের এ এক অনন্যসাধারণ অবদান। বিশ্বের দৃষ্টি এভাবে ফেরান তিনি বাংলার মানবিক ও চিত্তবৃত্তির ভাব-সমৃদ্ধির দিকে। বাংলার লোকজসংস্কৃতির সঙ্গে এ বিশ্বসংযোগ পরে বিযুক্ত হয়ে যায়। কারণ কোনো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এ ধারাটিকে বজায় রাখেননি। তাছাড়া ১৯২০-এর দশকে সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের বিপুল প্রসারে সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্র ইংল্যান্ড থেকে সরে আসে মার্কিন মুলুকে। ওই কেন্দ্রের সঙ্গে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বাংলার সম্পর্কসূত্র স্থাপিত হয়নি।[৭] নৃতত্ত্বের পণ্ডিতদের কিছু বিচ্ছিন্ন সংযোগ হয়েছিল, ফোকলোর তাতে গুরুত্ব পায়নি। ১৯৪৬-এ এসে বাংলা প্রবাদের উপর একমাত্র আলোচনাটি দেখি Journal of American Folklore[৮]-এ।

মৈমনসিংহ-গীতিকা বা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের গীতিকা যাঁরা সাহিত্য হিসেবে পড়বেন তাঁদের জন্য দীনেশ সেনের কাজ এখনো হার্ভার্ডের ইংরেজি সাহিত্যের প্রফেসর ফ্রান্সিস জেমস চাইল্ডের 'English and Scotish Ballad' (পাঁচ খণ্ড ১৮৯২-৯৮)-এর মতো মূল্যবান বিবেচিত হতে পারে। তবে সাহিত্য আর ফোকলোর এক জিনিস নয়।[৯] আমাদের দেশে সাহিত্যভিত্তিক ফোকলোরশাস্ত্রীরা এ দুইকে এক করে ফেলেছিলেন। ফলে 'লোর'-চর্চাই ছিল প্রধান। ফোক ছিল উপেক্ষিত। আধুনিক ফোকলোর-চর্চায় 'ফোর আর 'লোর' দুইই গুরুত্ব পাচ্ছে। নৃবিজ্ঞানীরা ফোকলোর-চর্চায় যুক্ত হওয়ায় 'ফোক'-এর গুরুত্ব ভিন্নভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। আমাদের দেশে নৃবিজ্ঞান-চর্চা না হওয়ায় ফোকলোর-চর্চাও হয়েছে একপেশে 'লোর'-চর্চা বা সাহিত্য হিসেবে ফোকলোরের বিবেচনা। সাহিত্য, নৃতত্ত্ব ও ফোকলোর ভিন্ন ভিন্ন ডিসিপ্লিন হিসেবে এখন আধুনিক বিশ্বে স্বীকৃত। বিশেষ করে ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি

সময় থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফোকলোর-চর্চায় যে অসাধারণ অগ্রগতি ঘটে গেছে তার ফলে ফোকলোরকে আর আবেগনির্ভর, স্বতঃস্ফূর্ততায় ভরা জাতীয়তাবাদী বা রোমান্টিক প্রয়াসের মধ্যে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ভূগোল, জাতিতত্ত্ব, সংস্কৃতি-তত্ত্ব এইসব বিষয়ের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে ফোকলোরের একটি বিজ্ঞানভিত্তিক আদল। অতিসম্প্রতি প্রখ্যাত ফোকলোর-তাত্ত্বিক ড্যান বেন-আমোস (Dan Ben-Amos), রিচার্ড বাওমান (Richard Bauman), অ্যালান ডান্ডেস (Alan Dundes) প্রমুখ ফোকলোরের নিজস্ব একাডেমিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমণ্ডল ও একাধিক research paradigm উদ্ভাবন করেছেন। ফোকলোর এখন বিষয় (Genre) বা গঠনকাঠামো (Structure) বা শুধু একটি বিচ্ছিন্ন আইটেম নয়, বরং একটি 'ইভেন্ট'—একটি প্রক্রিয়া (process) কোনো গ্রুপ বা বিশেষ গোষ্ঠীর জীবন্ত মিথস্ক্রিয়া। এই পুরো প্রক্রিয়া জীবনপ্রবাহকে অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্যে আনাই ফোকলোরিস্টের লক্ষ্য। আর এ কাজে ফিল্ডওয়ার্ক বাধ্যতামূলক। কারণ, পারফরম্যান্স, তার কনটেক্সট এবং লোকশিল্পী-কথক ও শ্রোতা-দর্শকের মিথস্ক্রিয়া (interaction) সংগ্রহের আর কোনো বিকল্প নেই এবং সেসব বিষয়ের সমন্বয়েই তৈরি হয়েছে ফোকলোর বিশ্লেষণের সর্বাধুনিক তত্ত্ব ও পদ্ধতি।

ফোকলোরকে একটি সারগ্রাহী (eclectic) বিজ্ঞানও বলা যায়। কারণ, সমাজবিজ্ঞানের মতো তা বহু বিদ্যা থেকে তত্ত্ব ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। ফোকলোর সংগ্রহের ক্ষেত্রেও এখন অনুসৃত হচ্ছে বৈজ্ঞানিক রীতি-পদ্ধতি এবং বিশেষ উপাদানের

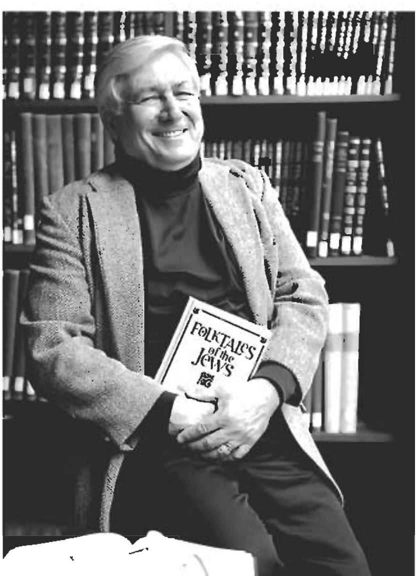

ড্যান বেন-আমোস

রিচার্ড বাওমান

জন্য উপযোগী কৌশল (technique) ও সমীক্ষাসূত্র। অন্যের সংগৃহীত উপাদান বা আর্কাইভসের সংগ্রহ নিয়ে এখন মূল কাজ করা যায় না—সহায়ক কাজের জন্যই এটা চলতে পারে। কারণ, অন্য কারো পূর্বসংগৃহীত উপাদান সামাজিক সচলতাহীনভাবে (dead archival materials) আর্কাইভসে দ্বিতীয় জীবনে (Second life) স্থিত থাকে। সমাজে সক্রিয় প্রথম জীবন থেকে তা বিচ্ছিন্ন। তাই নিরন্তর সরেজমিন সমীক্ষায় (continuous field work) অর্থাৎ একই বিষয়ে বারবার সংগ্রহের মাধ্যমে 'ফোক'-এর সঙ্গে 'লোর'-এর সম্পর্ক নির্ণয় করাই এখন ফোকলোর-চর্চার কেন্দ্রীয় বিষয়। 'ফোক'-এর কাছ থেকেই সংগ্রহ করতে হবে তাদের 'লোরে'র ব্যাখ্যা ও অর্থ।[১০] তাই ফোকলোর গবেষণায় এখন তথ্যদাতা (informant) অর্থাৎ গায়ক, তত্ত্বজ্ঞ, বয়াতি প্রমুখ ও গবেষক সমান মর্যাদার অধিকারী এবং তথ্যদাতার প্রতিশব্দ হিসেবে informant-এর পরিবর্তে interlocutor-এ উন্নীত। আগে গায়ক-বয়াতিদের ডেকে এনে শহরে বসে ফোকলোর সংগ্রহ করা যেত। অথবা অনভিজ্ঞ ছাত্রদের নিয়ে সংগ্রহ করা হতো গ্রামগঞ্জ থেকে। দীনেশ সেন পাকা হাতের সংগ্রহ পান চন্দ্রকুমার দে ও অন্যদের কাছ থেকে। এখন কিন্তু এর কোনো পদ্ধতিই গ্রাহ্য নয়। ফোকলোরিস্ট এখন প্রধানত এথনোগ্রাফার; তিনি মাঠে গিয়ে পারফরম্যান্স দেখে 'লোক' (Folk)-এর ঐতিহ্য অংশগ্রহণের জীবন্ত প্রবাহ রেকর্ড করে তবেই সংগ্রহ করেন।[১১]

বাংলা ফোকলোর-চর্চায় বিশ্বের সর্বসাম্প্রতিক পদ্ধতি-প্রকরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখনো নিদারুণভাবে অনুপস্থিত। বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও পদ্ধতিগত আধুনিকতার অভাবে চর্চার দীর্ঘ ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের মূল্যবান ফোকলোর উপাদানকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে পারিনি। একালে আধুনিক ফোকলোর-চর্চার চারটি প্রধান অঞ্চল যথা–মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, হাঙ্গেরিসহ পূর্ব ইউরোপ এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে ফোকলোরের উপর অন্তত ২৫টি উন্নতমানের গবেষণা পত্রিকা ও বহু সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এসব পত্রিকা/গ্রন্থে আমাদের কোনো ফোকলোর গবেষক বা পণ্ডিতের লেখা এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। ফিনল্যান্ড থেকে প্রকাশিত 'ফোকলোর ফেলোজ কমিউনিকেশনস'-এ (Folklore Fellows Communications) বিশ্ব ফোকলোর-চর্চার শত বছরের ইতিহাসে অসংখ্য নির্বাচিত রচনা/বই প্রকাশিত হলেও বাংলাদেশের কারো লেখা এখনো তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। শুধু একটি খণ্ডে ফুটনোটের মতো করে ড. মযহারুল ইসলাম-এর পিএইচডি. থিসিস, 'A History of Folktale Collections in India and Pakistan' (১৯৭০)-এর নামটা উল্লেখ করে Alan Dundes 'এ ধরনের আঞ্চলিক ইতিহাস নিয়ে বিশ্ব ফোকলোরের সামগ্রিক ইতিহাস লেখার কাজ হয়তো একদিন হবে'–এমন একটি মন্তব্য করেছেন। তবে বহু আগে ড. আশরাফ সিদ্দিকী ও ড. আবু সাঈদ মু. জহরুল হকের পরিচিতিমূলক যৌথ প্রবন্ধ Folklore Research in East Pakistan বেরিয়েছে ১৯৬৪ সালে Asian Folklore Studies-এ (১-১৪)। শুধু এইটুকুই সম্বল আমাদের বিশ্ব প্রেক্ষাপটে।

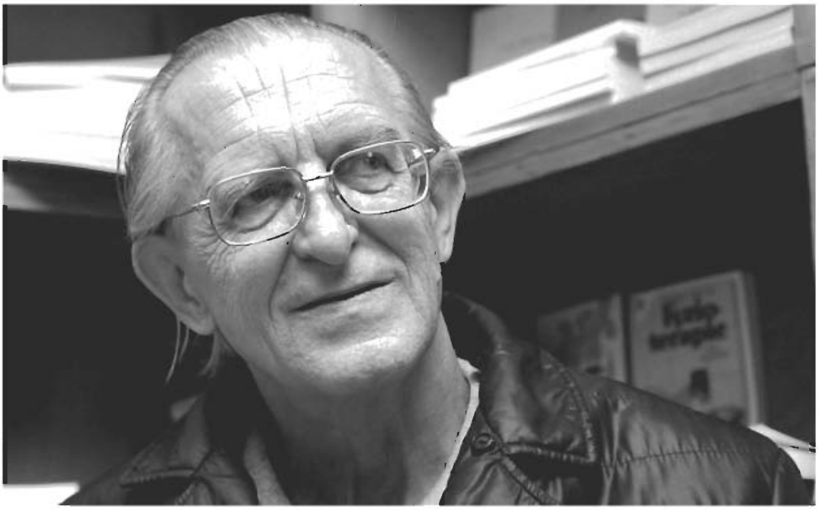

চেক পণ্ডিত দুশান জ্যাভিটাল

তাহলে কি বাংলা ফোকলোর-চর্চা এখনো বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ের মতোই রয়ে গেছে? এর উত্তরে আমাদের বলতেই হয়, মৌলিক বা গুণগত অগ্রগতি খুব একটা হয়েছে—এমন বলতে পারি না। উদাহরণ হিসেবে আমরা বাংলাদেশে গীতিকা (ballad) চর্চার কথা আনি। দীনেশ সেনের পর ক্ষিতীশ মৌলিক গীতিকার উপর নতুন সংগ্রহ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সংগ্রহ পদ্ধতি এবং গবেষণার গুণগতমানের বিচারে শ্রী মৌলিকের প্রয়াসে আমরা আধুনিক চিন্তা-চেতনার তেমন কোনো সুস্পষ্ট ছাপ লক্ষ করি না। বর্তমানে গীতিকার চর্চায় প্রসঙ্গসূত্র-নির্ভর গবেষণা (contextual research) এবং সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যের উপর যে জোর দেওয়া হয়েছে ক্ষিতীশ মৌলিকের সম্পাদনায় তার প্রয়োগ অনুপস্থিত। গীতিকা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মানের কোনো বাংলা বই নেই, অন্যদিকে বাংলাদেশ বা পশ্চিম বাংলায় কোনো উন্নতমানের ফোকলোর আর্কাইভস না থাকায় চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত উপাদানসমূহ সংরক্ষিত হয়নি। ফলে চন্দ্রকুমার দে'র সংগ্রহ এবং পরবর্তীকালে যাঁরা সংগ্রহ করেছেন তাঁদের সংগ্রহের তুলনামূলক বিচার যেমন মিল-অমিল, পাঠান্তর (Variant) বা পাঠভেদের পরিমাণ ও প্রকৃতি এবং উপস্থাপনাগত দিক থেকে ইতোমধ্যে কতখানি পার্থক্য ঘটে গেছে তা জানার উপায় নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চন্দ্রকুমার দে'র সংগ্রহ প্রকাশ করলেও ওই বিশ্ববিদ্যালয় বা কোনো ফোকলোর আর্কাইভসে চন্দ্রকুমার দে'র সংগৃহীত উপাদান সংরক্ষিত না থাকায় *মৈমনসিংহ-গীতিকার* প্রামাণিকতা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছিল। চেক পণ্ডিত দুশান জ্যাভিটাল (Dusan Zbavitel) ইংরেজি ভাষায় তাঁর সুবিখ্যাত বই[১২] লিখে *মৈমনসিংহ-গীতিকার* প্রামাণিকতা সম্পর্কে আমাদের নিশ্চিত করেছেন। কিন্তু তাতেও সব সমস্যার সমাধান হয়নি, যেমন—১৯৬০ সালে জসীমউদ্‌দীনকে নিয়ে

মৈমনসিংহ-গীতিকার সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে

লোকসাহিত্য সংগ্রাহক মোহাম্মদ সাইদুর

ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ-কেন্দুয়াসহ কোনো কোনো অঞ্চলে ঘুরে এসে দুশান বলেছেন, ময়মনসিংহে কোনো গীতিকা তিনি গীত হতে দেখেননি। তবুও নানা পরোক্ষ প্রমাণের সাহায্যে তিনি এর এককালের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পেরেছেন। এছাড়া কেন্দুয়ার আবেদ আলী বয়াতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি উপকৃত হন। বিশেষ করে ফোকলোর পারফরমার (Performer)-এর বিভিন্ন পরিবেশনার পার্থক্য ও তার নিয়ম তিনি বুঝতে পারেন। দুশান বিষয়টি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করেন তাঁর 'The Development of the Baromasi in the Bengali Literature' প্রবন্ধে।

মজার ব্যাপার হলো কিশোরগঞ্জের বিশিষ্ট লোকসাহিত্য সংগ্রাহক মোহাম্মদ সাইদুর প্রায় একই সময়ে ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসব পালাগান বা গীতিকা তখন সংগ্রহ করছিলেন এবং ১৯৬২ সালে তিনি বাংলা একাডেমির ফোকলোর বিভাগের অনিয়োজিত সংগ্রাহক নিযুক্ত হন এবং *মৈমনসিংহ-গীতিকার*[১৩] বেশ কিছু নতুন পাঠ সংগ্রহ করেন। ময়মনসিংহের পালাগানের অস্তিত্ব যখন প্রশ্নের সম্মুখীন তখনো কিন্তু কোনো গবেষক সাইদুরের মতো মাঠপর্যায়ের সমীক্ষা দূরে থাক, বাংলা একাডেমির সংগ্রহশালা হাতড়ে দেখে বলেননি যে সাইদুরের সংগ্রহই প্রমাণ করে *মৈমনসিংহ-গীতিকা* এখনো জীবিত অবস্থাতেই লভ্য। এই ঘটনা আমাদের ফোকলোর গবেষক ও পণ্ডিতদের সাম্প্রতিক ফোকলোর-চর্চার আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অনবহিতি ও অসতর্কতা এবং গবেষণাকর্মে শ্রম ও নিষ্ঠার অভাবকেই তুলে ধরে। বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হয়ে বাংলা একাডেমি গবেষণা সংকলন ও ফোকলোর বিভাগের পরিচালক হিসেবে আমি মোহাম্মদ সাইদুরের এ সংগ্রহ ১৯৮৫ সালে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশ করি। তবে ওই

বাংলা একাডেমির দ্বিতীয় ফোকলোর কর্মশালায় বাংলাদেশের মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ভারতের জহরলাল হান্ডু, ফিনল্যান্ডের লউরি হংকো এবং আমেরিকার হেনরি গ্লাসি

প্রকাশনার জন্য তাঁকে পুনরায় মাঠ সমীক্ষায় পাঠিয়ে তথ্যসূত্র, প্রসঙ্গ-পরিচিতি ও গায়কদের ছবিসহ তা প্রকাশ করা হয়।

সাইদুর নতুন নতুন পালা সংগ্রহ করলেও চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত এবং দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত *মৈমনসিংহ-গীতিকায়* অন্তর্ভুক্ত কোনো পালা সংগ্রহ করেননি। কারণ বাংলা একাডেমির তৎকালীন কর্মকর্তারা তাঁকে শুধু নতুন পালাই সংগ্রহ করতে বলেছিলেন। ফোকলোর গবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপ। এঁদের একটা পুরোনো ধারণা ছিল যে, যা সংগ্রহ করা হয়েছে তা চিরকালের মতো রক্ষা পেয়েছে, আর যা সংগৃহীত হয়নি তা-ই সংগ্রহ করা প্রয়োজন, যাতে হারিয়ে না যায়। এটা উনিশ শতকের survivalist-theory-র অন্তর্গত। বিশ শতকে এ পরিত্যক্ত ও ভ্রান্ত রীতিতে ফোকলোর গবেষণা করা হয়। কারণ একই পালা বারবার সংগৃহীত হলে তাতে যে ভিন্নতা ও পাঠভেদ বা পাঠান্তর (Variant) পাওয়া যেত আধুনিক ফোকলোর গবেষণার জন্য সেটাই হতো বিশেষ মূল্যবান। কারণ Text-এর Variation-ই ফোকলোর। সাহিত্যের মতো Stability ফোকলোরে অচল। বিশ্বনন্দিত রুশ ফোকলোরতাত্ত্বিক ভ্লাদিমির প্রপ (১৮৯৫-১৯৭৫) যথার্থই বলেছেন, 'Performers do not repeat their text word for word but introduce changes into them.' এই পরিবর্তনশীলতার নিয়ম (Law) ও ধারা আবিষ্কারই প্রকৃত ফোকলোরিস্টের কাজ। ড. আশরাফ সিদ্দিকী চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত ও দীনেশ সেন সম্পাদিত *মৈমনসিংহ-গীতিকার* সত্তর-আশি বছরের পুরোনো পাঠই হুবহু নতুনভাবে ভূমিকা লিখে বাজারে ছেড়েছেন। এ কাজ ফোকলোরের দৃষ্টিকোণ থেকে তাৎপর্যহীন ও অপ্রয়োজনীয়। কারণ, what is important is the fact of changeability of folklore compared with the stability of literature[১৪]। সিদ্দিকীর এ কাজ তাই ফোকলোর উপাদানকে স্থায়িত্ব দিয়ে সাহিত্যে রূপান্তরের পর্যায়ভুক্ত। এর কোনো গুরুত্ব নেই।

অ্যালান ডান্ডেস (সর্ববামে দণ্ডায়মান) ও তাঁর স্ত্রীর সাথে অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান (সাদা পাঞ্জাবি পরিহিত), জহরলাল হান্ডু (সর্বডানে দণ্ডায়মান) এবং অধ্যাপক খানের কন্যাত্রয়

১৯৮৬ ও ৮৭ সালে বাংলা একাডেমি আয়োজিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় জাতীয় ফোকলোর কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে যোগদান করে ফিনল্যান্ডের বিখ্যাত ফোকলোর পণ্ডিত প্রফেসর লাউরি হংকো বিষয়টির মুখোমুখি হয়ে যা বলেন তার মর্মার্থ এরকম, Strong tradition is deeply rooted, and hardly ties; it mattes and adjusted itself in a new situation. I am confident, Mymensing Ballads, still exist, may be in a slightly changed form. Go and look for it. I will prepare some clues for you. একটি সংগ্রহসূত্রসহ মোহাম্মদ সাইদুর ও অন্য কজন শিক্ষার্থীকে তিনি *মৈমনসিংহ-গীতিকার* নতুন পাঠ/পাঠান্তরে (variant) সংগ্রহের জন্য কিশোরগঞ্জে পাঠান। এই ফিল্ডওয়ার্কে বর্তমান লেখক এবং বাংলা একাডেমির ওই কর্মশালার প্রশিক্ষক মার্কিন ফোকলোর সোসাইটির তৎকালীন সভাপতি প্রফেসর হেনরি গ্লাসিও যোগদান করেন। আশ্চর্যের ব্যাপার প্রফেসর হংকোর রূপরেখা অনুযায়ী সরেজমিনে অনুসন্ধান চালিয়ে 'ভেলুয়া সুন্দরী' পালার আর একটি দীর্ঘ পাঠ কিশোরগঞ্জের পালা গায়কদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। কিশোরগঞ্জ শহরের প্রান্তে বগাদিয়া গ্রামে মোহাম্মদ সাইদুরের বাড়িতেই মূল দুজন গায়ক আমাদের এই পালা গেয়ে শোনান (১৮-১২-১৯৮৬)। আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপের পরে আমরা নবোদ্যমে ফোকলোর সংগ্রহ শুরু করি। তারই অংশ হিসেবে ১৯৮৯-এ কিশোরগঞ্জের দুর্গম ভাটি অঞ্চল মিঠামইনে আমরা সাইদুর সংগৃহীত এবং কলকাতা-দিল্লি মাত করা একালের অতিবিখ্যাত 'মাধব মালঞ্চি কইন্যা'র পালার পরিবেশনা দেখি। সাইদুরের সংগৃহীত পালার সেই চৌকিদার-

বয়াতি, সেই হারিকেন-হ্যাজাকসহ দেহাতি পরিবেশনা সবই আমরা পাই এবং বাংলা একাডেমির ভিডিওতে তা ধারণ করেন একাডেমির ভিডিওগ্রাফার মুরশিদউদ্দিন আনোয়ার। মিঠামইনের অ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমান ও তাঁর পরিবার এ কাজে আমাদের যে সহায়তা দেন তার তুলনা মেলা ভার।

বাংলাদেশের ফোকলোর-চর্চার দুর্বল অবস্থার কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ফোকলোর পঠন-পাঠনের বলতে গেলে কোনো ব্যবস্থাই নেই। আর এ কথা কে না জানে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ডিগ্রি প্রদান ও উচ্চতর গবেষণার বিষয় না হলে কোনো বিদ্যাই গুরুতর মনোযোগ ও চিন্তা-চেতনার বিষয় হয় না। ১৯৯২-এ ফিনল্যান্ডের তুর্কু শহরে অনুষ্ঠিত ফোকলোর সামার স্কুলে যোগ দিয়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে আমাকে বারংবার এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে যে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ফোকলোরের ডিগ্রি কোর্স নেই কেন? ফোকলোরের আধুনিক জ্ঞান ছাড়া কি বাংলাদেশের মতো কৃষিভিত্তিক লোক-ঐতিহ্যপ্রধান দেশে সংস্কৃতির ব্যাখ্যা সম্ভব? একজন একটু তির্যকভাবে বলেন, 'তোমাদের cultural elites-রা দেশের whole cultural system ও তার নানামুখী interaction এবং সৃজ্যমান নতুন জাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত কি না সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে।' অন্যদিকে প্রফেসর লাউরি হংকো যা বললেন তার মর্মার্থ এরূপ, 'আমরা ফোকলোরবিদরা বর্তমানে সবচেয়ে sophisticated and complete scholars, আমরা empirical জ্ঞানচর্চায় বিশ্বাসী। আমরা জ্ঞানের উৎসস্থলে যাই, ফিল্ডওয়ার্ক করি, নোট নেই, তথ্যদাতা বা সংলাপীর (informant) সঙ্গে দীর্ঘকালীন সংযোগ ও সংলাপ চালাই, ক্যামেরা-ভিডিও, কম্পিউটার-আর্কাইভস, মিউজিয়াম ও লাইব্রেরি ব্যবহার করি—তবু কি বাংলাদেশের পণ্ডিতেরা মনে করেন আমরা আধুনিক জ্ঞানচর্চা করি না?'

মৈমনসিংহ-গীতিকার ধারায় কিচ্ছাগান পরিবেশনরত কুদ্দুস বয়াতি ও তার দল

বাংলাদেশের সংস্কৃতি মূলত লোকজসংস্কৃতি। আমাদের সাংস্কৃতিক আত্মাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য দেশজ ঐতিহ্যের গভীরতার চর্চা অপরিহার্য। তবে শুধু 'ভাবের পাগল' বা 'সহজ পন্থায় সিদ্ধি লাভ নৈব নৈব চ'। এজন্য চাই সুশৃঙ্খল অনুশীলন ও শ্রমনিপুণ গবেষণা। বিশ্ব ফোকলোর-চর্চার সঙ্গে নিবিড় সংযোগ এবং তারই আলোকে নিজস্ব লোক উপাদানের তর্ক-তদন্ত-বয়ানসমৃদ্ধ আদল নির্মাণ। সেজন্যই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের সঙ্গে এই কোর্স খোলা যেতে পারে। বহু জাতি-উপজাতির দীর্ঘকালের বাসস্থান হিসেবে চট্টগ্রামও লোক ও এথনি সংস্কৃতিচর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হতে পারে। সিলেটের শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ও হতে পারে এর জন্য খুবই উপযুক্ত জায়গা। সিলেটবাসীরা আমাদের বিদেশি প্রশিক্ষকদের সিলেটে দেওয়া এক সংবর্ধনায় শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোকলোর কোর্স খোলার ওয়াদা করেছিলেন। সে ওয়াদা পূরণ হয়নি। তবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর আব্দুল খালেক ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৮ সালে ফোকলোর বিভাগ ও উচ্চ পর্যায়ের কোর্স খুলেছেন। এজন্য তাঁকে এবং নতুন বিভাগীয় প্রধান ড. মুহম্মদ আবদুল জলিলকে অভিনন্দন। আশা করি এই নতুন ফোকলোর বিভাগ ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠবে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, প্রফেসর মনসুর উদ্দীন প্রমুখ বহু বছর ধরে একটি ফোকলোর ইনস্টিটিউট করার প্রস্তাব করেছিলেন। অনেকদিন যাবৎ একটি জাতীয় ফোকলোর ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার কথা শোনাও যাচ্ছে। এ ব্যাপারে অবিলম্বে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দুই

বাংলাদেশের ফোকলোর জন্মলগ্ন থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। আমাদের দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষ অনক্ষর, তবুও আশ্চর্যজনকভাবে এ কথা সত্য যে ব্যাপক গ্রামীণ জনগোষ্ঠী তাদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি থেকে যে জীবনরস, বিবেচনাশক্তি, বিচার-বুদ্ধি ও বিশ্বদৃষ্টি লাভ করেছে তাদের মানবীয় গুণাবলি বৃদ্ধি ও শ্রেয়-চেতনার উৎকর্ষ সাধনে তার গুরুত্ব অনেক। এর ফলে গ্রামীণ সমাজে ক্রিয়াশীল থেকেছে এক সুস্থ-সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, যা মানুষের মৌলিক মিলন ও সংহতির ক্ষেত্রকে করেছে প্রশস্ত। মানুষের বিচার হয়েছে মানুষ হিসেবেই, যেমন লালনের গানের মানুষ 'মানুষ রতনে' উন্নীত; আবার কলিযুগে তাঁর কাছে 'মানুষই অবতার', অথবা বলা যেতে পারে শেষ কথাটা তিনি এভাবেই বলেন, 'সর্বসাধন সিদ্ধ হয় তার, ভবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার।' আসলে সমাজের লোক-মানসে লোকজসংস্কৃতির প্রভাবেই ইহজাগতিক ধ্যানধারণা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে, গড়ে উঠেছে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও পরমতসহিষ্ণু এক সাংস্কৃতিক পদ্ধতি (cultural system)। বিভিন্ন ধর্ম এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক না হয়ে বরং পরস্পরের মধ্যে সহ-অবস্থানের পথ করে নিয়েছে। বিচার গান, কবিগানে মানসিক যুক্তিবাদ গ্রামীণ বুদ্ধিবৃত্তিক ধারাকে সবল ও পুষ্ট করেছে। এসব গানে বিভিন্ন ধর্মমতের প্রতি প্রশ্নবিদ্ধ আলোচনাও কোনো উত্তেজনা-

উন্মত্ততা সৃষ্টি করেনি। বস্তুতপক্ষে বিভিন্ন লোককবি, বয়াতি ও মারফতি গায়ক, ভাবুক-চিন্তক নানা ধর্মের সারাৎসারকে যুক্ত করে এক সাধারণ মানবীয় ঐতিহ্য সৃষ্টিতে নিয়োজিত থেকেছেন। ফলে শাস্ত্রীয় ধর্ম ও ধর্মীয় মৌলবাদ লোকজ ধর্ম ও মানবিক বহুত্ববাদী (Pluralistic) চেতনায় ভাস্বর সাধারণ ঐতিহ্যের বিপুল আকর্ষণের কাছে বাস্তবসম্মত কারণেই বিশুদ্ধভাবে টিকে থাকতে পারেনি। যারা এক সময় বাউলদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে এবং পর্বতপ্রমাণ মূঢ়তায় কবি নজরুলকে 'কাফের' আখ্যা দিয়েছে তাদের উত্তরসূরিরা পরে লালনকে 'মহান সাধক' এবং নজরুলকে 'জাতীয় কবি' হিসেবে আখ্যা দিয়েছে মতলবি ধর্মীয় চেতনায়। তবু বলতেই হয়, ইতিহাসের প্রবল স্রোতে লৌকিক জীবন-চেতনা ও সমন্বিত সাধারণ ঐতিহ্যের প্রাধান্যকে মেনে নিয়েই তারা এর মুখটা ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছে।

তিন

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ভারতীয় সভ্যতার মৌল সত্তার বর্ণনা করতে গিয়ে যে রূপকল্পটি (Metaphor) ব্যবহার করেছেন তা হলো, 'Palimpsest'...that Indian civilization is like some ancient Palimpsest, on which layer upon layer of thought and revery had been inscribed and yet no succeeding layer had completely hidden or erased what had been written previously. All of these existed together in our conscious or sub-conscious selves, though we might not be aware of them'. বাংলাদেশের হাজার বছরের লৌকিক সংস্কৃতির বিকাশধারাও এরকম স্তরের পর স্তর যুক্ত হয়ে তা এমনভাবে মিলেমিশে এক শক্তিশালী মিশ্র বা সমন্বিত সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে যে তাকে আলাদা করা কঠিন।

চৈতন্য যুগের কবি চণ্ডিদাস বলেছিলেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি সংস্কৃতির বিপুল উত্থানের সেই যুগে অমন মহৎ উচ্চারণ বাঙালিকে অসামান্য মর্যাদা দিয়েছে। বাংলার লোকমানসে গেঁথে যাওয়া এ বিশ্বাস ও বোধ আমাদের গ্রামীণ সামাজিক সংহতি ও সোশ্যাল এনলাইটেনমেন্টের প্রধান কারণ। তা না হলে পরবর্তীকালে শিক্ষা-দীক্ষাহীন, জীর্ণ, দুর্দশাগ্রস্ত গ্রামজীবনে কেমন করে সমন্বয়বাদী সংস্কৃতি চেতনা ও অসাম্প্রদায়িকতা এতটা শিকড়-প্রোথিত হয়ে উচ্চারণ করে, 'মানুষ থুইয়া খোদা ভজ এই মন্ত্রণা কে দিয়াছে' (কেন্দুয়ার লোককবি জালাল খাঁর রচনা)। চণ্ডিদাস থেকে জালাল খাঁর এ বোধের পেছনে গৌড়ীর বৈষ্ণব ধর্মের অদ্বৈতবাদ (সোহম) এবং মুসলিম সুফিতত্ত্বের (আনাল হক) প্রভাবে জীবাত্মা পরমাত্মার অভিন্নতা প্রতিফলিত হওয়ার মানুষ খোদা বা ভগবানের সত্তার অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। লালন, দ্বিজদাস, দুদ্দু শাহ, হাসন রাজাসহ অগণন লোককবির রচনায় এই দীপ্র মানব-চৈতন্যে ভাস্বর পঙ্‌ক্তিমালা হরহামেশাই দেখা যায়। ব্যাপারটি বিস্ময়কর; সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরাধীন ঔপনিবেশিক এবং পশ্চাৎভূমি (Hinterland) প্রতিম পূর্ববাংলায় এ মানবিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগৃতি যে

১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উদ্যোগী হয়ে কাজী নজরুল ইসলামকে ঢাকা এনে জাতীয় কবির স্বীকৃতি দিয়ে ফুলের মালা পরিয়ে দেন

ঘটে গেল তার মূল কারণটি কী? এ জাগরণ উনিশ শতকের কলকাতাভিত্তিক বাংলার জাগরণের চেয়ে বেশি ব্যাপক ও তাৎপর্যময় বলেই মনে হয়।

আমার বিবেচনায় পূর্ববাংলার এই নবজাগরণের ভিত্তিমূলে আছে ফোকলোর। শুধু সামাজিক সুস্থতা, মানবিক মূল্যবোধ ও বিচার-বুদ্ধি নয়, গোটা পূর্ববাংলাকে এক উদার সত্তায় পরিণত করে স্বাধীন সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের উদ্ভবের ক্ষেত্রেও লোকজসংস্কৃতি ও সমন্বিত জীবনযাত্রার প্রভাব মৌলিক। এ-ও লক্ষ করার মতো যে, রাষ্ট্রপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেন লোকায়তিক বাংলাদেশের একেবারে ভেতর-প্রেরণাকে অনুধাবন করেই 'সোনার বাংলা'কে সুরে বিন্যস্ত এবং বাংলাদেশের হৃদয় থেকে উঠে আসা। শিল্পী কলিম শরাফীর কাছে শিল্পকলা একাডেমীতে আমাদের ফোকলোরের সকল প্রাচীন ও প্রচলিত ফর্ম (Form) সংগ্রহ করার কথা বলা এবং লোকশিল্পীদের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক সম্পর্কও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

চার

ফোকলোর স্থবির (static) নয়, জঙ্গম, চলমান (dynamic)[১৫]। আর্থ-সামাজিক, মানসিক, মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে এর রূপান্তর ঘটে। নতুন সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে তৈরি হয় নতুন ফোকলোর। এই রূপান্তরই লোকসংস্কৃতির প্রাণ। সমাজ পরিবেশ যদি খুবই বৈরী হয়ে ওঠে তাহলে মূলধারার লোকজসংস্কৃতি সাময়িকভাবে কিছুটা সুপ্ত অবস্থায় চলে যেতে পারে। এ ধরনের

পরিস্থিতিতে চলতি হাওয়ার পন্থি কোনো উপাদান সামনে আসতে পারে, তবে সেটা অনেকদিন একটা প্রলেপ হিসেবেই থাকে এবং একটু ভেতরের স্তরে নজর করলেই দেখা যাবে মৌলিক উপাদানসমূহ প্রায় অবিকৃত অবস্থাতেই রয়ে গেছে। কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—নব্বইয়ের দশকের প্রথমদিকে আমরা শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার, মাধবপুর, মোহনপুর, নড়াইল, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা, পাইকগাছা এবং রংপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা এলাকা ঘুরে দেখেছি পাকিস্তান আমলের সাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এমনকি বাংলাদেশ আমলের সংস্কৃতি চর্চায় মুসলিম-প্রাধান্য (Muslim bias) সত্ত্বেও ভেতরে অটুট রয়েছে চৈতন্য আমলের কূলপ্লাবী 'কানু ছাড়া গীত নাই'-এর মূলধারার লোকসংগীতের প্রাধান্য। রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গান, ধামাইল, কৃষ্ণলীলা, রামযাত্রা, ভাওয়াইয়া, কুশান গান, জারি, সারি, মুর্শিদি-মারফতি, দেহতত্ত্ব, বাউল গানের ফল্গুধারা অর্থাৎ সাবেক কালের সমন্বয়বাদী লোকজসংস্কৃতির মৌলিক ভিত্তির উপর একটা আরোপিত আবরণই শুধু ধীরে ধীরে পুরু হয়ে উঠেছে। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা এবং সামরিক স্বৈরতন্ত্রসহ নানা সরকারের সাম্প্রদায়িকতাঘেঁষা বা আধা সাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক নীতির কারণে দেশের লোকজসংস্কৃতি একটা অনিশ্চিত অবস্থা এবং অস্থিরতার কাল অতিক্রম করছে। বেতার-টেলিভিশন বা ভিসিআর-এ গ্রামীণ সংস্কৃতি ভোক্তা যা পায় তা তাদের জন্য সহজপাচ্য নয়। কিছু বুঝে কিছু না বুঝে এক ধরনের মজা হিসেবে তারা একে গ্রহণ করতে পারে, বাকিটা থাকে তাদের সাংস্কৃতিক বোধ ও মানস পরিমণ্ডলের বাইরে; কারণ এই বিনোদন-উপাদান কোনো দীর্ঘ কালপরিক্রমা অতিক্রম করে দেশের মানুষের সংস্কৃতি-পদ্ধতির অংশ হয়ে ওঠেনি,

বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলার চন্দ্রধর কুশানে ও তাঁর দলের কুশান গান পরিবেশন

মনসামঙ্গলের আখ্যান অবলম্বনে দক্ষিণবঙ্গের নারীদের পরিবেশনে রয়ানিগান

ফলে এটা জাতিগত (ethnic) বাংলা মানসিক মনস্তাত্ত্বিক ভৌগোলিক ভিত্তি পায়নি। অথচ এখন আগের মতো জনগোষ্ঠীর ভেতর থেকে উদ্ভূত সহজ স্বাভাবিক আনন্দময় জারি, মারফতি, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা, কীর্তন-ভজন, গাজন, গাজীর গান, গম্ভীরা, আলকাপ, ভাসান যাত্রার দীর্ঘকালীন স্বকীয় সাংস্কৃতিক ভূগোলটির অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। গ্রামীণ ভাবুক-চিন্তকের বিচার গান, কবিগান, দেহতত্ত্বের গান, বাউল গানের তাত্ত্বিকতার সেই ঘনসংবদ্ধতাও এখন অবশিত প্রায়। এই গায়করাই ছিলেন গ্রামীণ বুদ্ধিজীবী ও বিনোদনশিল্পী। একদিকে মৌলভি-মওলানা, স্কুলশিক্ষক, পণ্ডিত–অন্যদিকে বেদ, পুরাণ, কোরআন, বাইবেল, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কারবালা কাহিনি, শরিয়ত-মারফত, নবি কাহিনি, মা ফাতেমা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সীতা, সাবিত্রীসহ বহু বিচিত্র বিষয় ও বহু শাস্ত্রে অভিজ্ঞ এইসব কবিয়াল-গায়ক গাতক, বয়াতি, গীদাল লোকসমাজের ধর্মীয় ও অন্যবিধ জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছেন তাঁদের তত্ত্বকথামূলক নানা গান, পালা ও কথকতায়। গ্রাম-জীবনের সেই সাংস্কৃতিক ধারা এখন অনেকাংশে উন্মুল। শত শত বছরের পুরোনো বাংলার যাত্রাগান পর্যন্ত এখন স্বাভাবিকভাবে অভিনীত হতে পারে না। এবং গ্রামাঞ্চলে নতুন কোনো ধারাও গড়ে ওঠেনি। অপরাজনীতি, শিক্ষাব্যবস্থার হীন অবস্থা, আধিপত্যবাদ, সন্ত্রাস ও নীতিভ্রষ্টতার ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক বিভ্রান্ত অবস্থা।

আগে গ্রামবাংলার মানুষ তিন-চারটি প্রধান সূত্র থেকে তাদের সাংস্কৃতিক চাহিদার জোগান পেত। যেমন ধর্মীয় উৎস যথা—মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির, ধর্মসভা, মিলাদ,

যাত্রার অভিনয়ে বাংলার অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রকাশ ঘটেছে বারবার

ওরশ, ওয়াজ, নামকীর্তন, পূজা, ঈদ ইত্যাদি। এ উৎসব বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রয়োজন মিটাত। এর কোনো কোনো অনুষ্ঠান-উৎসবে ধর্মীয় আন্তঃসম্প্রদায়ের লোকসমাগম ছিল বিশেষ লক্ষণীয়, এতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সামাজিকতা ও প্রীতি-সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। দুই : লোকজসংস্কৃতির উৎস : লোকজসংস্কৃতি ছিল প্রধানত ধর্মনিরপেক্ষ এবং সমাজের সাধারণ ঐতিহ্যগত সম্পদ। এতে আনন্দ লাভ এবং সাংস্কৃতিক রস-পিপাসা নিবৃত্তির মধ্য দিয়ে মানবিক চেতনা ও সামাজিক উৎস। এশিয়ায় ব্যক্তির চেয়ে সমাজের যে গুরুত্ব তার মৌল স্বরূপ এখানেই নিহিত; তিন : গ্রামীণ রাজনীতি ও ভোট-পঞ্চায়েত, ইউনিয়ন এবং জাতীয় নির্বাচনে একধরনের উৎসব ধর্মীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। এখন এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চতুর্থ ধারা—বেতার, টেলিভিশন, হিন্দি ও বাংলা সিনেমা, ভিসিআর, এনজিও কার্যক্রম, এমনকি সেলফোন পর্যন্ত। গ্রামীণ নিজস্ব সংস্কৃতি হিসেবে কৃষি ও শিল্পমেলা, মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা, কোথাও কোথাও রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী, নববর্ষ উৎসব, জসীম মেলা বা নাটক-বিচিত্রানুষ্ঠান, যাত্রাগান, গাজীর গান ইত্যাদির পরিবেশনা মাঝেমধ্যে হয়ে থাকে। এই চতুর্থ ধারা থেকে গ্রামবাংলার নতুন ইতিবাচক সংস্কৃতি ধারা গড়ে উঠে বর্তমান শূন্যতা পূর্ণ হবে এমন প্রত্যাশা আমাদের। তবে এই ধারার প্রবল শত্রুপক্ষ হলো স্যাটেলাইটে নিম্নমানের হিন্দি সংস্কৃতির আগ্রাসন এবং মৌলবাদের হিংস্র ছোবল।

মানিকগঞ্জের কামতা গ্রামে গাজীর যাত্রা পরিবেশন

পাকিস্তান আমলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার যে সাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক নীতি ও তার পক্ষে আদর্শগত প্রচার চলে তা বাঙালি জাতীয়তাবাদী সক্রিয় সংস্কৃতি কর্মীদের প্রবল আন্দোলন সত্ত্বেও ব্যর্থ হয়ে গেছে, এ কথা বলা যাবে না। ভাষা আন্দোলন, ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবও সুস্পষ্টভাবে পড়তে থাকে। হাজার বছরের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের সঙ্গে প্রকৃত সমন্বয়হীন নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমানের চেতনায় মুসলমানিত্বের ঝোঁক প্রাধান্য পেয়েছে। অন্যদিকে রুটি-রুজির সূত্রে বিপুল মানুষের মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে সংযোগ প্রকৃত মর্মে না হলেও বাহ্যিকভাবে মানুষকে বেশ পরিমাণে সাম্প্রদায়িক করেছে। এই প্রভাব কাজ করেছে ধীরে ধীরে—প্রথম দিকে তা বোঝাই যায়নি; পরে স্পষ্ট হয়েছে। পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকেও আমরা জারিগান, মুর্শিদি গানের সঙ্গে কৃষ্ণলীলা, রামযাত্রা, সীতার বনবাস এসবও হতে দেখতাম। পরে শেষোক্তগুলো প্রায় দেখাই যায়নি। অর্থাৎ লোকজসংস্কৃতির উপরও রাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক আদর্শের প্রভাব পড়েছে। বাংলাদেশ আমলেও পুরোনো ধারার নতুন বিন্যাস ঘটেনি, বরং পাকিস্তান আমলে সূচিত ধারাই ক্রিয়াশীল আছে। পাকিস্তানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সামরিক স্বৈরশাসকদের 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ,' 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে রেডিও-টেলিভিশনে ধর্ম ও সংস্কৃতির যে ধরনের প্রজেকশন হয়েছে তাতে এটা হওয়াই স্বাভাবিক। মানুষের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক মুক্তির নিশ্চয়তা বিধানে ব্যর্থ হয়ে এর প্রকৃত শিক্ষা-বঞ্চিত মানুষকে ধর্মীয় আবর্তে টেনে নেয়। অনুন্নত দক্ষিণ এশিয়ার এ-ও এক প্রবণতা।

পাঁচ

বাংলাদেশে শিক্ষার ভিত্তি অবৈজ্ঞানিক ও দুর্বল। সুচিন্তিত জাতীয়তাবাদী, বিজ্ঞানভিত্তিক এবং বিশেষভাবে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সুদীর্ঘ উত্তরাধিকার-নির্ভর উদার মানবিক শিক্ষাব্যবস্থা এখানে গড়ে না ওঠায় গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, যুক্তিবাদ ও আন্তর্জাতিক সচেতনতা আমাদের শিক্ষার প্রধান বিষয় হতে পারেনি। ফলে ধর্ম প্রবণতা, লাভ ও লোভ আমাদের জীবনে বড় হয়ে উঠেছে। এইসব আবিলতা এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ইসলামিকরণের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠলেও সাম্প্রতিককালে কিছু আশাব্যঞ্জক নতুন প্রবণতাও আমরা লক্ষ করছি। বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন পাকিস্তান আমলে বাধার মুখে পড়েছিল। তবু 'ছায়ানট' ষাটের দশকে রমনার বটমূলে যে ঐতিহ্যিক ভিত্তিটি অঙ্গীকারদীপ্ত প্রত্যয়ে গড়ে তুলেছিল আজ তা ভদ্রজনের মিলনমেলায় রূপান্তরিত হলেও বিপুল-বিশাল নগরবাসী মধ্যবিত্ত বাঙালির মধ্যে ঐতিহ্য অন্বেষার এক নতুন পটভূমি (context) তৈরি করেছে। উদার মানবিক ও ঐতিহ্যমণ্ডিত কিন্তু আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তি এভাবেই নির্মিত হচ্ছে।

জার্মান ফোকলোর পণ্ডিত প্রফেসর হারমান বসিংগারের (Hermann Bausinger) ভাষায়, নগর এবং শিল্পাঞ্চলে এক নতুন natural environment পেয়েছে। নগর হচ্ছে নতুন ফোকলোরের habitat. বস্তি, নোংরা, অনির্মল আকাশ, দেশের নানা অঞ্চলের মানুষের নানা বোধ ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, নানা পেশাজীবী গ্রুপের ঐক্য সব মিলে এক বিচিত্র জগৎ। ফলে ফোকলোর বিলুপ্ত হচ্ছে না বরং নগরেই এর সম্প্রসারণ ঘটছে।[১৬]

জার্মান ফোকলোর পণ্ডিত প্রফেসর হারমান বসিংগার

একটু মন দিয়ে বাংলাদেশের ফোকলোরের রূপান্তরের দিকে তাকালেও আমরা এই সত্যের মুখোমুখি হই। আমাদের ফোকলোর নগরেও নতুনভাবে শিকড় গড়েছে। গড়ে উঠেছে নগর ফোকলোরের নতুন কনটেক্সট। ব্যক্তি ও সমাজজীবনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ফোকলোরের দৃঢ় অবস্থান ছাড়াও শহর ঢাকায় পৌষ মেলা, নবান্ন উৎসব, বাউল উৎসব, লোক-নাট্যোৎসব এর উদাহরণ। রাজনীতি সংক্রান্ত দেয়াললিখন, গোপন লিফলেট, গুজব, চুটকি এসবও নতুন ফোকলোরের উদাহরণ। যেমন— ১৯৮৩ সালের পর ঢাকায় চালু চুটকিটি। তখন সবে মার্শাল ল হয়েছে। এক ব্রিগেডিয়ারের ছেলে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করছে, Dad, What is a Martial Law? ব্রিগেডিয়ার : M' Law. M' Law, M' Law, I am a Brig. suppose, I am the Martial Law. ছেলে : Who is Govt then. ব্রিগেড : Suppose your mother is the Govt. she Manages the house hold affairs. ছেলে : Who are the People? ব্রিগেড : People, People...Oh suppose our servants and maidservants are the people. ছেলে : Now, I understand. You are the Martial Law, mother is the Govt. and our servants are the people. এক রাতে টুংটাং শব্দে ছেলের ঘুম ভাঙে। সে ফিসফাস শব্দ শুনে চুপচুপি উঠে পা টিপে টিপে ড্রয়িংরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখে ব্রিগেডিয়ার এক চাকরানির উপর উপগত। দেখে দ্রুত বিছানায় ফেরে এবং নিজ মনে বলে, Now everything is clear to me. My powerful army father is the M' Law, my weak mother is the Govt. and when she is asleep, army raped the people. জনগণের মার্শাল ল বিরোধিতা থেকে কী তীব্র ও ঝকমকে নতুন ফোকলোর তৈরি হয়েছে। হরতালের বর্তমান বাস্তবতাকে তুলে ধরার জন্য 'ভয়তাল' শব্দের উদ্ভাবনাও চমৎকার ফোকলোর। সারা বিশ্বে প্রতিবাদ ও ঘৃণা-প্রকাশক কুশপুত্তলিকা দাহ্ করাও ফোকলোর থেকে এসেছে।

বাংলাদেশের আমলে বাংলা নববর্ষ উৎসব নতুনভাবে বিন্যস্ত হয়ে এক বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে। এমনকি স্বৈরাচারী ও বকধার্মিক এরশাদ সরকার ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণার পর গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক কর্মী মহলে তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিবাদও লক্ষ করা গিয়েছিল মোক্ষমভাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট ইনস্টিটিউট [বর্তমানে চারুকলা অনুষদ]-এর ছাত্র-শিক্ষক ও দেশের সংস্কৃতিকর্মীরা বিগত প্রায় এক যুগ ধরে নববর্ষের দিনে যে বর্ণাঢ্য মিছিল বের করে আসছেন তা নতুন ঐতিহ্য নির্মাণের এক তাৎপর্যপূর্ণ পর্যায়। এতে আগের কালের গ্রামীণ 'লোকমিছিলে'র[১৭] বৈশিষ্ট্য, আমেজ ও সমন্বয়বাদী ঐতিহ্যধারা পুরোপুরিই এসেছে। অবরুদ্ধ অবস্থার মধ্য থেকে লোকজসংস্কৃতির এই নাগরিক উদ্ভব ও বিস্ফোরণ মৌলবাদী ও ধর্ম-পুঁজিনির্ভর ছদ্মবেশী চরম ভণ্ড ও অসৎ রাজনীতিকদের মুখেও চপেটাঘাত করে দেখিয়েছে যে শিকড়-সংলগ্ন সংস্কৃতিকে আরোপিত সংস্কৃতি দ্বারা নির্মূল করা যায় না। এই ঘটনা লোকজসংস্কৃতির অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও নতুন ইতিবাচক ও মৌলিক ঘটনাপ্রবাহের

পহেলা বৈশাখ মঙ্গল শোভাযাত্রা

সঙ্গে নিজেকে যে খাপ খাইয়ে নিতে পারে তারই পরিচয়বহ। হারমান বসিংগারের প্রযুক্তির যুগে লোকজসংস্কৃতির বিলুপ্তি নয়, সম্প্রসারণের তত্ত্বই এতে প্রমাণিত হয়। ছায়ানট, বাংলা একাডেমি, নকশা কেন্দ্রের নববর্ষ উৎসব ও বৈশাখী মেলাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান নতুনভাবে নতুন তাৎপর্যে প্রতি বছর ব্যাপক থেকে ব্যাপকভাবে উদ্‌যাপিত হয়ে লোকজসংস্কৃতির এক নতুন পদ্ধতি-কাঠামো (New cultural system structure) গড়ে তুলছে। এছাড়া সাভারে অজ্ঞাতনামা শহীদদের উদ্দেশে নির্মিত জাতীয় স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন অঞ্চল, বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমি ও শিশু একাডেমীর কিছু এলাকাসহ ঢাকা শহরের ধানমন্ডি ও গুলশান-বারিধারা এলাকায় সারা বছর ধরে মৃৎশিল্পের যে পসরা সাজানো দেখা যাচ্ছে তা লোকজসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ভিন্নরূপে পুনরাবির্ভাব। এরই সঙ্গে উল্লেখ্য, এলিফ্যান্ট রোড, সাকুরা মার্কেট, মহাখালী, গুলশান অঞ্চলে তামা-কাঁসা-পিতলের শিল্পনৈপুণ্যে ভাস্বর ও নব নব উদ্ভাবনাময় কাজের বিপুল প্রসার। একসময়ের এইসব প্রয়োজনের উপকরণ (utilitarian objects) এখন শৈল্পিক উপাদানে (artifact) পরিণত হয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সমকালীন রুচি ও সৌন্দর্যবোধকে নিবৃত্ত করছে। তবে এতে লোকশিল্পের ভাবগভীরতা ও নান্দনিক বৈভব কিছু কম। এ হলো হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতির কোনো কোনো প্রধান উপাদানের নাগরিক উত্থান।

ফোকলোর আমাদের সংস্কৃতির প্রধান উপাদানই শুধু নয়, ক্ষেত্রবিশেষে এর নিয়ন্ত্রক শক্তিও। আমাদের এলিনিয়েটেড বা সমাজবিচ্ছিন্ন বুদ্ধিজীবী ও বিশুদ্ধবাদী সাহিত্যকর্মীরা লোকজসংস্কৃতির এই বিপুল শক্তি, সম্ভাবনা ও প্রতিরোধক্ষমতা সম্পর্কে

একুশে ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় শহীদ মিনারে অলংকরণ ও ফুলসজ্জা

খুব একটা সচেতন, এমন মনে হয় না। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আবু বকর সিদ্দিকদের একপ্রস্থ লেখা পড়ে এমন ধারণাই হয়। কোনো সমাজবিজ্ঞানীর লেখায় এখনো দেখিনি এমন একটি প্রসঙ্গ তুলি। বিশে ফেব্রুয়ারির বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আলপনা আঁকা, রাতে ও একুশের সকালে শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া, প্রভাতফেরি এ-ও তো এখন একটি ঐতিহ্য। ঐতিহ্য যে নতুন করে সৃষ্টি হয় এবং বলবান হয়ে ওঠে এ তো তারই নজির। শহীদ মিনার ও সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ এখন National Identity Symbol-এ পরিণত। ঢাকা শহরের রিকশা-অটোরিকশা ও ট্রাকেও লোকশিল্পকলার চর্চা হচ্ছে। রিকশায় সিনেমার নায়ক-নায়িকা এবং অটোরিকশায় নিসর্গ, পশুপাখি ও দেশ-বিদেশের চিত্র, তাজমহল স্থান পায়। রেডিও-টিভির বিজ্ঞাপনেও ফোকলোরের উদ্ভাবনাময় ব্যবহার লক্ষ করি। কমিউনিকেশনের এই বিপুল বিস্ফোরণের যুগে ফোকলোরের এই প্রবণতা। এ বিষয়গুলোকে সহজে ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু এর বাইরে আমি সাম্প্রতিক একটি বিষয়কে ফোকলোরের অন্তর্ভুক্ত করব। হুমায়ূন আহমেদের সিরিজ নাটকের 'বাকের ভাই' চরিত্রটি 'আদর্শবাদী সন্ত্রাসী' হিসেবে চিহ্নিত—নাটকে যার ফাঁসি হয়। 'আদর্শ-সন্ত্রাসী'—এই শব্দদ্বয়ের বিরোধের মধ্যেই কি চরিত্রটির জনপ্রিয়তার মূল নিহিত? আগে কোনো কোনো ডাকাত অত্যাচারী ধনীদের বাড়িতে ডাকাতি করে ডাকাতির সম্পদ গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিত। এ যুগের আদর্শবাদী সন্ত্রাসীতে কি তার রূপান্তরিত চিত্র পাচ্ছি?

একটি নাটকের চরিত্রের ফাঁসি নিয়ে মিছিল, শ্লোগান, প্রায় মারদাঙ্গা কোন সামাজিক বাস্তবতায় প্রতিফলিত তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এছাড়া ওয়ালিমা, বউভাত,

ডাকটিকেটে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-এর প্রতিকৃতি

জন্মদিন, মিলাদ, কুলখানি, চেহলাম ইত্যাদিও নাগরিক ফোকলোরের অন্তর্ভুক্ত। আরো একটি ঐতিহ্য প্রবল ও প্রায় সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছে। সেটি হলো শহরে বিয়েতে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান। গাঁও-গ্রামে আগে বিয়েতে পাশা খেলা, কাদার মধ্যে মাখামাখি, গায়ে হলুদ এসব বিচ্ছিন্নভাবে হতো; আর শহরে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান এবং তার ভিডিও ধারণ এখন এক প্রবল ও অপরিহার্য সাধারণ ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। বিবাহের ভোজের মধ্যে আধুনিকতা ও ঐতিহ্য পাশাপাশি চলছে। সেনাকুঞ্জ, অফিসার্স ক্লাব বা কোনো কমিউনির্টির বিয়ের গেট সাজানো, গাড়ি, মেহমানদের পোশাক-আশাকের জেল্লা সত্ত্বেও রিচুয়্যাল, খাওয়াদাওয়ার উপাদান ও ধরন ঐতিহ্যিক অর্থাৎ বহু বছর ধরে প্রায় একই রকম। অতএব ড. আহমদ শরীফের ঐতিহ্যবিরোধিতা সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে কী পরিমাণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অন্তঃসারশূন্য তা সহজেই অনুমেয়। ভরসার কথা, শ্রদ্ধেয় কালাপাহাড়ের পিতৃব্য আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ঐতিহ্য-চিন্তায় সঠিক পথেই ছিলেন। তিনি বলেছেন, '...মনে রাখিবেন ঐতিহ্য হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার অর্থ জীবন হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া, জীবন হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার অর্থ মৃত্যু।'

শুধু দেশে নয়, আমাদের লৌকিক মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য বিশ্ব জয় করেছে। সম্প্রতি লন্ডনে বাংলাদেশের বাঙালি রেস্তোরাঁ 'রয়াল অর্কিড' ইউরোপের বর্ষসেরা হোটেলের মর্যাদা পেয়েছে, আমাদের ঐতিহ্যগত একটি সামাজিক মূল্যবোধের জন্য। ঘটনাটি এরকম : এক মহিলা মাঝেমধ্যে ওই হোটেলে খেতে আসেন অথবা খাবার অর্ডার দিয়ে তা বাড়িতে নিয়ে যান। একদিন তিনি খাবারের অর্ডার দিয়েছেন, কিন্তু খাবার খেতে বা নিতে আসেননি। নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাওয়ার পর হোটেল মালিক ভদ্রমহিলার বাড়িতে ফোন করেন তাঁকে খাবারের অর্ডারের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে। ভদ্রমহিলা জানান, তাঁর এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মারা যাওয়ায় তিনি খাবার আনতে যেতে পারেননি। তবে হোটেলের বিল তিনি যথারীতি মিটিয়ে

দেবেন। এই কথোপকথনের কিছু পরে হোটেল মালিক বেশ কিছু খাবার নিয়ে সেই মহিলার বাড়িতে হাজির। মহিলা একটু বিব্রত, বুঝি ভেতরে কিছুটা বিরক্তও। বললেন, 'আপনাকে না বললাম, আপনার বিল আমি শোধ করে দেব। খাবারগুলো বাড়িতে কেন নিয়ে এসেছেন?' বাংলাদেশের বাঙালি হোটেল মালিকের উত্তর, ম্যাডাম, আমি পয়সার তাগিদে বা আপনার অর্ডারের খাবার নিয়ে আসিনি। এসেছি আমার দেশের একটি লোক-প্রথা পালন করতে। আমাদের দেশে কোনো বাড়িতে কেউ মারা গেলে সে বাড়িতে রান্না হয় না। আত্মীয়-প্রতিবেশী বা বন্ধু-বান্ধব ওই বাড়িতে খাবার পাঠায়। আপনি আমার অনেকদিনের ক্লায়েন্ট ও বলতে পারি সুহৃদ ও পৃষ্ঠপোষক। তাই আমার দেশের প্রথাটি পালন করতেই আপনার বাড়িতে আসা। ভদ্রমহিলা এ কথা শুনে অভিভূত। পরে তিনি বাংলাদেশের এই সুন্দর সামাজিক প্রথা ও হোটেল মালিকের মানবিক বোধের প্রশংসা করে পত্রিকায় এক হৃদয়ছোঁয়া চিঠি লেখেন। তারই ফলে ওই হোটেলের ইউরোপ-সেরার গৌরব লাভ।

ফোকলোরের অমিত শক্তি ও নতুন সম্ভাবনা আমরা গত কয়েক বছর যাবৎ চমৎকৃত হয়ে লক্ষ করছি। '৮৯-এর ডিসেম্বরে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয় আমাদের মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিজয় মেলা। মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনার সঙ্গে মৌলিক মেলার এ সংযোগ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। লোকজসংস্কৃতি এভাবেই আমাদের মৌল রাজনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে এবং এতে কী বিপুল সম্ভাবনা ছিল তা দেখা গেল ১৯৯১ সাল থেকে নিয়মিতভাবে প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসব্যাপী বাংলাদেশের প্রায় সব জেলা-উপজেলা, এমনকি ইউনিয়ন ও গ্রামে অনুষ্ঠিত বিজয় মেলায়—অর্থাৎ লোক-উৎসব ও মুক্তিযুদ্ধের বিজয় উৎসবের মধ্য দিয়ে ঐতিহ্য ও আধুনিক চেতনার কী অপূর্ব সমন্বয়!

পদটীকা

১. সুকুমার সেন : *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩।

২. পূর্বোক্ত, ১৫।

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

৪. Folklore research shown that tales, and many other items of folklore, have traveled from culture to culture and across national and linguistic boundaries throughout history. While each people may leave their special impression on a tale, no one culture can claim ownership. Questions of origin, even if they could be answered (and they usually cannot) fade into irrelevance when one considers the variable experiences a tale acquires during it life history Folkloristics and Indian Folklore—Peter Claus and F.J. Korom, P.6.

৫. 'Performance usually suggests and aesthetically marked and heightened mode of communication, framed in a special way for an audiance'.—Richard Bauman.

৬. ভারতীয় দর্শন কংগ্রেস ও বিলেতে হিবার্ট লেকচারে বাউল ও হাসন রাজার গানের উল্লেখ।

৭. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তখন ফোকলোর-চর্চার নবযুগ শুরু হয়েছে, বিশেষ করে নৃবিজ্ঞানীদের এক্ষেত্রে এগিয়ে আসার ফলে। দীনেশ সেনের কাজ নিয়ে সেখানে কোনো সাড়া দেখি না। সেনের কাজ লিটারেরি ফোকলোরিস্টের ধরনের জন্য কি?

৮. Journal of American Folklore, Vol. 59. October-December 1946, Np. 234-107 Bengali Proverbs—By Charles Ferguson and W.D. Perston.

৯. 'Performers do not repeat their texts word for word but introduce changes into them. Even if these changes are insignificant (but they can be very great), even if these changes that take place in folklore texts are sometimes as slow as geological process, what is important is the fact of changeability of folklore compared with the stability of literature.' V. Propp, the History and Theory of Folklore.

১০. 'The central concern of the field is to discover the patterns, functions and meaning of those communicative resources...'

১১. 'A different stance, one long familiar to anthropologists and now championed by many folklorists may be called the ethnological orientation. Its main focus is the group of people that produces the lore and provides the live cultural matrix within which a text is articulated and understood.' Dynamics of Folklore, Second Edition 1996, p. 4-5.

১২. Folk Ballads From Mymensing and the Problems of their Authenticity Calcutta University 1963.

১৩. Ballad-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'গীতিকা' সুন্দর ও যথার্থ তবে বহুলাংশে এলিটিস্ট; 'পালা' কথাটা সাধারণ্যে প্রচলিত। তবে 'পালা'ও সমস্যামুক্ত নয়। অনেক কিছুকেই 'পালা' বলা হয়, যেমন 'যাত্রাপালা' আবার 'মহুয়া পালা'। আসলে তাত্ত্বিকভাবে এবং মাঠ-গবেষণা নির্ভর অনুপুঙ্খ জেনর (Genre) বিশ্লেষণ বাংলাদেশে এখনো হয়নি।

১৪. 'A work of folklore exists in constant flux, and it cannot be studied in depth if it is recorded only once. It should be recorded as many times as possible. We call each recording a 'variant', and these variants are something completely different from a version of literature made by one and the same person,' p. 8, V. Propp, *ibid.*

১৫. *See* The Dynamics of Folklore Barre Toeklen, Boston 1979.

১৬. Folk Culture in A World of Technology : Herman Bausinger 1990.

১৭. মানিকগঞ্জের সিংগাইর থানার সাহরাইল গ্রামের সিদ্ধাবাড়ির মেলার মিছিল ছিল অতি বিখ্যাত।

শামসুজ্জামান খান রচিত *সাম্প্রতিক ফোকলোর ভাবনা* (ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ ২০১৭) শীর্ষক গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত। এই মুদ্রণে অন্তর্ভুক্ত ছবি ইন্টারনেট ও সম্পাদকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে গৃহীত।